ceÜ

চিন্তার বিপ্লবী প্রকল্প ও ‘বিকল্প পাঠশালা’

ফরহাদ মজহার

হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদের সামরিক সরকার এবং সামরিক আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রামের সময় তরুণ ছাত্রদের মধ্যে থেকে গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্ব যাঁরা দিয়েছিলেন তাঁদের প্রায় কাউকেই পরে আমরা রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখিনি। কেন এটা হলো, কেন একটা শক্তিশালী বিপ্লবী রাজনীতির ধারা তরুণদের মধ্য থেকে গড় উঠল না তার ব্যাখ্যা প্রায়ই দেওয়া হয় নেতৃত্বের ব্যক্তিগত ব্যর্থতার জন্য। অর্থাৎ কোনো ব্যাখাই আসলে দেওয়া হয় না। ইতিহাস ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে এখনো ব্যক্তিকেই আমরা প্রধান কর্তাসত্তা বলে মনে করি। ব্যক্তির ভূমিকা আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তার বিপরীতে ঘটনাঘটনের যে একটা নৈর্ব্যক্তিক বা অবজেকটিভ ব্যাপারস্যাপারও থাকে বাংলাদেশের ভাবনাচিন্তার মধ্যে তার প্রাধান্য নাই বললেই চলে। এটা খুবই বিস্ময়ের। অথচ বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময় কাল হচ্ছে সামরিক সরকার ও সামরিক আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াই এবং সেই লড়াইয়ের এক পর্যায়ে শ্রমিক, ছাত্রও কৃষকদের বৈপ্লবিক মৈত্রী গড়ে ওঠার সম্ভাবনা। দ্বিতীয়ত, সেই সম্ভাবনা নস্যাৎ হয়ে যাওয়া। এই সম্ভাবনা নস্যাৎ করে দেবার রণধ্বনি বা স্লোগান ছিল, ‘এক দফা এক দাবি এরশাদ তুই কবে যাবি’। অগণতান্ত্রিকও প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া শ্রেণী সরকার ও রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক রূপান্তরের প্রশ্নকে পর্যবসিত করল ক্ষমতার চরিত্র ও কাঠামো অক্ষত রেখে নিছকই একজন ব্যক্তিকে ক্ষমতা থেকে অপসরণ করবার দাবিতে। যেন হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদকে ক্ষমতা থেকে সরালেই বাংলাদেশে গণতন্ত্র কায়েম হয়ে যাবে। সেটা যে হয় না এবং কাজে কাজেই হয়নি সেটা এখনকার বাংলাদেশ দেখলে আমরা অনায়াসেই বুঝব।

অন্যান্যদের মধ্যে এই রাজনীতির বিরুদ্ধে সবচেয়ে সক্রিয় ও উচ্চকণ্ঠ ছিল ছাত্র ঐক্য ফোরাম। অনেকেই হয়তো এই ছাত্র সংগঠনটি সম্পর্কে খুব একটা জানেন না। মূলত ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ঐতিহাসিক দশ দফা প্রণয়নের ক্ষেত্রে ছাত্র ঐক্য ফোরামের অবদান ছিল অসামান্য। কিন্তু রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক রূপান্তরের লক্ষ্যে আন্দোলনের সংস্থাগুলোর বিজয়ের মধ্য দিয়ে নতুন সংবিধান সভা গঠন ও নতুন গণতান্ত্রিক সভা প্রণয়নের যে ধ্রুপদি বিপ্লবী দাবি তরুণ বিপ্লবীরা তুলেছিলেন সেই দাবি তাঁরা সামনে নিয়ে আসতে পারেননি। প্রচারের দিক থেকে যেমন তাঁরা ব্যর্থ হয়েছিলেন, অন্যদিকে সাংগঠনিক ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তারা জয় লাভ করতে পারেননি। সামরিক সরকার ও সামরিক আমলাতন্ত্রিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের এক পর্যায়ে বিদ্যমান সংবিধান, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র কাঠামো টিকিয়ে রাখার জন্য ‘সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা’র কথা তুলে সংবিধানের এমন সংস্কার করা হলো যাতে অগণতান্ত্রিক ও গণবিরোধী রাষ্ট্রটিকে টিকিয়ে রাখা যায়। ছাত্র ঐক্য ফোরাম তখনও সবেমাত্র ছাত্রই। ফলে এই ব্যর্থতার একটা বড়ো কারণ ছিল অভিজ্ঞতার অভাব। দ্বিতীয় কারণ এই ধরনের কর্মসূচি সফল করবার জন্য যে বিপ্লবী সংগঠন দরকার সেই ধরনের সংগঠন গড়ে তুলবার বাস্তবিক শর্ত তখনও বাংলাদেশে উপস্থিত ছিল না। পরে ছাত্র

> জ্ঞান চর্চা নয়। কিন্তু জ্ঞানের চর্চা ছাড়া বিপ্লব কথাটার কোনো মানে হয় না। বিপ্লব মাত্রই প্রজ্ঞার বাস্তবায়ন। মানুষ প্রকৃতি বা ইতিহাস সম্পর্কে প্রজ্ঞা তার পুরনো অবস্থান বিচার করে যখন নিজে আরো বিকশিত হয়ে ওঠে, যখন নতুন ধারণা, ইচ্ছা, সংকল্প তৈরি হয়। সেই ধারণার সঙ্গে যদি বাস্তব বা বৈষয়িক অবস্থার বিরোধ ঘটে, তখন তার মীমাংসার জন্যই বিপ্লব।

ঐক্য ফোরাম এই শর্তের অভাবকে প্রধানত বিপ্লবী মতাদর্শ ও চিন্তার অভাব হিসাবে শনাক্ত করেছিলেন। যে কারণে তাঁদের ঘোষণা ছিল বাংলাদেশে বাস্তবতার বিপ্লবের ‘ভারকেন্দ্র’ হচ্ছে মতাদর্শিক চর্চা ও তৎপরতা। অর্থাৎ বিপ্লবী চিন্তার চর্চা ও বিকাশ ছাড়া চিন্তাশূন্য সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড দিয়ে বাংলাদেশে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলা যাবে না। বাংলাদেশের মৌলিক পরিবর্তনও অসম্ভব।

বাংলাদেশে বিপ্লবী সংগঠন ও আন্দোলন বিকশিত না হবার পেছনে ছাত্র ঐক্য ফোরামের এই সার কথা আদৌ সঠিক নাকি সঠিক নয় সেই তর্ক তখনও যেমন চলেছে, এখনও চলতে পারে। তবে সমাজে সব সময়ই কূটতর্ক করার মানুষই বেশি থাকে। কূটতর্ক মানে যাঁরা তর্ক করেন নিজের জীবন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য নয়, তর্কের খাতিরে তর্ক করার জন্য। পরবর্তীতে ছাত্র ঐক্য ফোরাম নানান কারণে ভেঙে যায়, কিন্তু দুটো অংশ টিকে থাকে। একটি ধারা সংগঠনটিকে তার নামে

ধরে রাখে। অর্থাৎ হিসেবে ছাত্র ঐক্য ফোরাম টিকে যায়। এই নামের অধীন কৃষক, শ্রমিক ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে সংগঠন গড়ে তুলবার আন্তরিক প্রচেষ্টা চালানো হয়। এই অংশের ঐতিহাসিক তাৎপর্য হচ্ছে ঐখানে যে ছাত্র ঐক্য ফোরাম নামে যে চিন্তা এক সময় স্ফুরিত হয়েছিল তার দাগ এই অংশ মুছে ফেলতে দেয়নি। ধরে রেখেছে। তাঁদের সম্পর্কে যদি বিপ্লবী সততার জায়গায় দাঁড়িয়ে কোনো সমালোচনা করা হয় তবে সেটা প্রধানত হবে মতাদর্শিক তৎপরতাই।

বাংলাদেশে বিপ্লবের 'ভারকেন্দ্র' কথাটির গুরুত্ব তাঁরা ধরতে পারেননি বা ধরতে পারলেও তার চর্চা তাঁরা করতে সক্ষম হননি।

অপর অংশ চিন্তার চর্চা করেছে অবশ্য, কিন্তু রাজনৈতিক সাংগঠনিক তৎপরতা গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে। ইতিমধ্যে পার্টি, আন্দোলন সংগ্রাম, বিপ্লব সম্পর্কে পৃথিবীব্যাপী ধ্যানধারণার যেমন পরিবর্তন হয়েছে। অন্যদিকে সোভিয়েট ইউনিয়নের ভাঙন, চীনের পুঁজিতান্ত্রিক রূপান্তর ইত্যাদি চিন্তার ক্ষেত্রে নতুন সংকট তৈরি করেছে। এই সংকটের মোকাবেলা পৃথিবীর অন্য কোন দেশে সম্ভব হয়েছে বলা যাবে না। তবে ইতিমধ্যে বিপ্লবী চিন্তা, এর নীতি ও কৌশলের প্রশ্নেও নতুন ভাবনা জন্ম হয়েছে ইত্যাদি নানা কারণে ছাত্র ঐক্য ফোরামের এই অংশ নতুন করে দল গড়বার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁরা একটা ছাপ ফেলে যেতে পেরেছেন।

এদের মাঝখানে একটি দোদুল্যমান ধারা ছিল- যে কোনো রাজনৈতিক লড়াই সংগ্রামেই থাকে। সংগঠনের সংকটের সময় এই ধারা অতি সহজেই ছাত্র ঐক্য ফোরামকে ছত্রভঙ্গ করতে সফল হয় এবং যথারীতি বিদ্যমান পেটিবুর্জোয়া বা প্রতিক্রিয়াশীল বামপন্থার মধ্যে নিজেদের বিলীন করে দেয়।

ছাত্র ঐক্য ফোরাম বা আশি দশকের রাজনৈতিক সংগ্রাম এখানে আমার আলোচনার বিষয় নয়। আমি কথাটি তুলছি এই কারণে যে বাংলাদেশের বাস্তবতার চিন্তার চর্চাই বিপ্লবের ভারকেন্দ্র- ছাত্র ঐক্য ফোরামের এই ঘোষণা আমার ধারণা বাংলাদেশের চিন্তাশীলতা এবং বৈপ্লবিক বিকাশের প্রথম ও প্রধান চাবিকাঠি। এই সত্য অতিশয় স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন। রাজনীতির অর্থ যে শুধু চিন্তাশূন্য সংগঠন বা পার্টি গঠন নয় মার্কস, লেনিন ও মাও জে দংয়ের এই শিক্ষা সম্ভবত ছাত্র ঐক্য ফোরাম যতোটা বৈপ্লবিক তৎপরতা ও আকাঙ্ক্ষায় চর্চা করেছে তেমনটি আর বাংলাদেশের ইতিহাসে দেখা যায়নি।

চিন্তা চর্চার ক্ষেত্রে আশির দশকে ছাত্র ঐক্য ফোরাম কয়েকটি প্রকল্প হাতে নেয়। সেই প্রকল্পগুলোর সঙ্গে আমার নিজের সম্পৃক্ততা ছিল। সেই সময়ের চিন্তার চর্চার বৈপ্লবিক গুরুত্ব আমি এখনও বুঝতে পারি এবং তার প্রাসঙ্গিকতা এখনও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। প্রথম প্রকল্প ছিল, মার্কস, এঙ্গেলস বা লেনিনের দিক থেক 'রাষ্ট্র' কথাটার মানে কি ছিল? আসলে রাষ্ট্র বলতে তাঁরা কি বুঝিয়েছেন। যাঁরা নিজেদের মার্কসবাদী বা বিপ্লবী মনে করেন তখন তাঁরা 'রাষ্ট্র' বলতে যা বোঝেন বা বোঝান তার সঙ্গে মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিনের পার্থক্য কি? তরুণ বিপ্লবীরা এই বিষয়ে স্পষ্ট ছিলেন যে এই প্রশ্নের মীমাংসা না করা গেলে 'বিপ্লব' কথাটির মানেও বোঝা যাবে না। একই সঙ্গে 'ক্ষমতা', ক্ষমতা দখল, 'বুর্জেয়া রাষ্ট্র ভেঙে ফেলা'-ইত্যাদি ধারণাগুলোও পরিষ্কার হবে না। সোজা কথায় বিপ্লবী রাজনীতির বিকাশ অসম্ভব হবে এটা পরিষ্কার ছিল যে লেলিনের 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' রাষ্ট্র সংক্রান্ত চূড়ান্ত তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত নয়, বরং সিদ্ধান্ত নেবার দিকনির্দেশনা মাত্র। এই পুস্তিকাটি ছিল যাকে বলে পোলেমিকাল রচনা। বিপক্ষ রাজনৈতিক ধারার সঙ্গে তর্ক করবার জন্য লেখা।

রাজনৈতিক বিপ্লবের পরে খেটে খাওয়া শ্রেণীর রাজনৈতিক দল বিদ্যমান বুর্জোয়া রাষ্ট্রটি নিয়ে কি করবে সেটা ছিল বিতর্কের প্রধান দিক। রাষ্ট্রকে যেমন আছে তেমনি রেখে শুধু ক্ষমতায় গেলেই কি বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটানো সম্ভব? নাকি খেটে খাওয়া শ্রেণীকে নতুন ধরনের 'রাষ্ট্র' নতুন ধরনের 'ক্ষমতা' তৈরি করতে হবে?

এইসব ছিল পুস্তিকাটির মৌলিক প্রসঙ্গ। কি করে তাহলে নতুন ধরনের রাষ্ট্র, নতুন ধরনের ক্ষমতা তৈরি করা যায়? এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য রাষ্ট্র, আইন, ক্ষমতা, ক্ষমতার প্রয়োগ, রাষ্ট্র ক্ষমতা ও রাষ্ট্র কাঠামোর পার্থক্য ইত্যাদি বহু বিষয়ের মীমাংসা দরকার। অনেকে মনে করেন, এই প্রশ্নগুলোর মীমাংসার জন্য মার্কস, লেনিন, মাওয়ের অনুসারীরা আন্তরিক ছিলেন না বলেই আজ সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীনের এই দুর্দশা। অন্যদিকে কিউবার সাফল্যের অভিজ্ঞতা থেকেও বিশেষ কোনো শিক্ষা বিপ্লবী রাজনীতি নিয়েছে বলে মনে হয় না। আজ কিউবার প্রেরণায় নতুনভাবে ল্যাটিন আমেরিকায় শ্রমিক, কৃষক নির্যাতিত মানুষ মেরুদন্ড সোজা করে উঠে দাড়াচ্ছে আবার।

দ্বিতীয়ত, প্রকল্প ছিল আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য থেকে কীভাবে বিদ্যমান ক্ষমতার বিপরীতে নতুন ক্ষমতা তৈরি করতে হয় তার প্রক্রিয়া ও কৌশল বিচার। বলাবাহুল্য, আশির দশকের আন্দোলন- সংগ্রামের এটা ছিল মুখ্য বিষয়। কি করে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা আন্দোলনের সংস্থার নেতৃত্বে গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বিদ্যমান ক্ষমতা ও ক্ষমতাসীন শ্রেণীকে উৎখাত করার পর অবিলম্বে সংবিধান সভা ও নতুন সংবিধান রচনার কাজ হাতে নিয়ে হয় এবং নতুন ক্ষমতা ও নতুন ধরনের রাষ্ট্রকে রূপদান করতে হয় তার প্রক্রিয়া ও কৌশল বিচারের

বাংলাদেশের চিন্তাশীলতা এবং বৈপ্লবিক বিকাশের প্রথম ও প্রধান চাবিকাঠি। এই সত্য অতিশয় স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন। রাজনীতির অর্থ যে শুধু চিন্তাশূন্য সংগঠন বা পার্টি গঠন নয় মার্কস, লেনিন ও মাও জে দংয়ের এই শিক্ষা সম্ভবত ছাত্র ঐক্য ফোরাম যতোটা বৈপ্লবিক তৎপরতা ও আকাঙ্ক্ষায় চর্চা করেছে তেমনটি আর বাংলাদেশের ইতিহাসে দেখা যায়নি।

ক্ষেত্রে লেনিনের শিক্ষা অসাধারণ এবং মৌলিক। বলশেভিক বিপ্লবের সফলতার পেছনে এটাই ছিল মূল কারণ। এই শিক্ষার পুনরাবৃত্তি কি করে করা যায় সেটা ছিল ঐক্য ফোরামের ধ্যান, জ্ঞান ও চর্চার বিষয়।

তৃতীয় প্রকল্প ছিল, 'ইতিহাস', 'অর্থশাস্ত্র,' উৎপাদন সম্পর্ক', 'শ্রেণী,' 'শ্রেণী সম্পর্ক' ইত্যাদি বলতে মার্কস কি বুঝিয়েছেন, তাঁর ধারণার সঙ্গে বুর্জোয়া ও পাতিবুর্জোয়া শ্রেণীর নানাবিধ অনুমান, ধ্যানধারণার পার্থক্য কোথায়?

চতুর্থ প্রকল্প বা বলা যেতে পারে সব প্রকল্পের গোড়ার প্রকল্প ছিল 'মত,' মতাদর্শ,' 'চিন্তা', 'চিন্তাশীলতা' ইত্যাদি আসলে কি? কিভাবে সমাজ, ইতিহাস, বস্তুজগৎ, ভাবজগৎ ইত্যাদি বর্ণনা ও ব্যাখ্যার জন্য 'ভাষা' তৈরি হয়? কাকে আমরা ideology বলব, কাকে বলব বিজ্ঞান বা নিশ্চয় জ্ঞান? মার্কসবাদ নিজেই কি একটা ইডিওলজি বা মতাদর্শ নয়? একইভাবে ধর্ম আর মতাদর্শের সঙ্গে কি পার্থক্য? ধর্ম যেমন একটা মত মার্কসবাদই কি তেমনি একটা মত নয়? তাহলে মার্কসবাদের সঙ্গে ধর্মের কি পার্থক্য? মার্কসবাদ যেমন বিশ্বাস, ধর্মও কি তেমনি বিশ্বাস!! তাই কি? 'বিশ্বাস' আর 'চিন্তা'র মধ্যে কি পার্থক্য? কেউ যদি বলে আমি আল্লায় 'বিশ্বাস' করি আর তার বিপরীতে অন্যজন বলেন আমি 'বিশ্বাস' করি 'যুক্তি', 'বুদ্ধি' বা 'চিন্তায়'- তাহলে দুটোই তো আসলে বিশ্বাস। কিসের ফারাক? এখন কেউ যদি আল্লার জায়গায় যুক্তি, বুদ্ধি বা চিন্তাকে বসায় তাহলে সেটা ধর্মতত্ত্ব নয়, আর আল্লা থাকলেই সেটা ধর্ম নয়- এটা তো হতে পারে না। অতএব ইডিওলজি, মতাদর্শ বা ধর্ম বলতে মার্কস কি বুঝিয়েছেন তার একটা বিচার অবশ্যই দরকার আছে।

বাংলাদেশে চিন্তাশীলতা ও বিপ্লবী রাজনীতির বিকাশ এবং তার ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিপ্লবী চিন্তা নিজের শৃঙ্খলার জন্য যে প্রকল্পগুলো আশির দশকে নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছিল তার গুরুত্ব অপরিসীম। এর উপযোগিতা এখনো পুরো মাত্রায় বিদ্যমান।

কিন্তু এই প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের জন্যও কিছু সংক্ষিপ্ত পদক্ষেপ চাই। সেই পদক্ষেপগুলো হবে পাঠচক্র বা সবাই মিলে পড়া ও শেখার বিকল্প স্কুল তৈরি করা। ছাত্র ঐক্য ফোরাম কয়েকটি বই কেন্দ্রে রেখে তাদের পাঠচক্রগুলো সংগঠিত করেছিল। লেনিনের ছিল ১. 'কি করতে হবে?' ২. সোশ্যাল ডেমোক্র্যোসি বা বিপ্লবী রাজনীতির 'দুই রণকৌশল', ৩. 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' এবং ৪. পুঁজিতন্ত্রের চরম স্তর হিসাবে 'সাম্রাজ্যবাদ। মার্কস আর এঙ্গেলসের ছিল, 'জার্মান ভাবাদর্শ', 'অর্থশাস্ত্র' পর্যালোচনার ভূমিকা এবং তরুণ বয়সে মার্কসের লেখা 'ইহুদিদের প্রশ্নে' এবং মাও জে দংয়ের 'দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে'। এতসব গ্রন্থ থাকা সত্ত্বেও কেন এই অল্প কয়েকটি বই আশির দশকে বেছে নেয়া হয়েছিল, তার পেছনে প্রচুর চিন্তাভাবনা ছিল। কিন্তু সমগ্র গ্রন্থের মধ্যে যে বইটির কেন্দ্রীয় গুরুত্ব অনস্বীকার্য ও অন্য সব পাঠের নির্ণায়ক বলে গণ্য হতো সেটি হলো 'জার্মান ভাবাদর্শ'।

কিন্তু আশির দশকে 'জার্মান ভাবাদর্শ' নিয়ে বেশ কয়েকটি পাঠচক্র হবার পরেও বইটির ওপর দাঁত বসানো বা ঠিক মতো বুঝে ওঠা বলতে যা বোঝানো হয় সেটা হয়ে ওঠেনি। সেই সময় ছাত্র ঐক্য ফোরামের কেন্দ্রীয় নেতা গৌতম দাস জার্মান ভাবাদর্শের অনুবাদ করতে শুরু করেন এবং এর নানান দিক নিয়ে অত্যন্ত ইতিবাচক তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়। গৌতম অনুবাদ করা শেষও করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে সাংগঠনিক সংকটের কারণে তাঁর অনুবাদ আর প্রকাশিত হয়নি। দুর্ভাগ্য যে, খসড়াটিও হারিয়ে যায়।

বাংলাদেশে বিপ্লবী চিন্তাকে আরো গুছিয়ে সুসংগঠিতভাবে হাজির ও বিচার করবার একটা দায় আবারও নানা কারণে এসে পড়েছে। বাংলাদেশ ও পৃথিবীর ইতিহাসও আজ আর একই জায়গায় নেই। আফগানিস্তান, ইরাক ও মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি, ল্যাটিন আমেরিকায় গরিব ও খেটে খাওয়া শ্রেণীর রাজনৈতিক উত্থান, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নিপীড়িত মানুষের মরণপণ লড়াই ইত্যাদি নানা কারণে স্লোগানসর্বস্ব বিপ্লবী ভানের বিপরীতে গঠনমূলক বৈপ্লবিকতার দিন পুরোদমে আবার ফিরে আসছে। আসতে বাধ্য। কিন্তু সেটা আবারও ব্যর্থ হবে যদি চিন্তার ক্ষেত্রে আমরা পরিচ্ছন্ন না হই এবং যে শ্রেণী ও মানুষের জন্য আমরা কাজ করতে চাই তাদের আমরা যেন না চিনি। তাদের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, আকৃতি, সংকল্পের সঙ্গে সম্যক পরিচিতি ও একাত্মতা যেমন দরকার একই সঙ্গে তাদের পক্ষে নতুন 'ভাষা' তৈরিও এখনকার প্রধান ও প্রথম কাজ।

এই কাজের কথা ভেবে আমার মনে হয়, আশির দশকে বিপ্লবী চিন্তার প্রকল্পগুলোর কথা মনে রেখে এখন পাড়ায় পাড়ায়, জেলায় জেলায় ও গ্রামে পাঠচক্র সংগঠিত করা খুবই ইতিবাচক কাজ হবে। অন্যেরা হয়তো এই প্রকল্পগুলোর বাইরে বা একে সমালোচনা করে আরো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলতে পারেন। সেটা বিতর্কের বিষয় নয়। কাজের মামলা। আমার এই লেখার উদ্দেশ্য ছাত্র ঐক্য ফোরামের সাফাই গাওয়া বা প্রশংসা নয়। নিজের সম্পৃক্ততা ছিল বলে মানবিক দুর্বলতা থাকবে, কিন্তু আমার রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে সেই দুর্বলতার কোনো স্থান নেই। কথা হলো আমরা যারা বিভিন্ন দলে বা নানা কারণে সমাজে নানা জায়গায় বিভক্ত হয়ে আছি, অথচ একদিন মজুরি-দাস আর পুঁজির প্রভুত্বের বিদ্যমান বিভাজন ভেঙে যাবে, মানুষের সত্যিকারের ইতিহাস শুরু হবে- এই বিশ্বাস বা কার্ল মার্কসের দেওয়া প্রতিশ্রুতি যারা এখনো ত্যাগ করেনি, যদি এই প্রশ্নগুলোর মীমাংসা আমরা আন্তরিকভাবে ভাবি তাহলে বহুদূর আমরা এগিয়ে যাব। বাংলাদেশের এখনকার পরিস্থিতি কাটিয়ে আমরা যদি যেতে চাই তাহলে রাজনৈতিক-সাংগঠনিক তৎপরতার দরকার আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু কি তার লক্ষ্য, কি তার উদ্দেশ্য, কি নীতি ও কৌশল ইত্যাদি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমরা এখনো অস্বাভাবিকভাবে পিছিয়ে আছি।

এই লক্ষ্যে জার্মান ভাবাদর্শ আবার অনুবাদ করা যায় কি না তার জন্য গৌতম দাসের সঙ্গে আমি যোগাযোগ করায় তিনি সানন্দচিত্তে তার প্রধান অংশ আবার অনুবাদ করেছেন। লেনিনের বইগুলো বাংলায় পাওয়া যায়। অর্থশাস্ত্র পর্যালোচনার ভূমিকা আমি নিজে এর আগে অনুবাদ করেছি। তার মানে যে প্রশ্নগুলো ওপরে তুলেছি তার মীমাংসার জন্য প্রাথমিক প্রস্তুতি আমাদের আছে। এখন দরকার আন্তরিকতার সঙ্গে চিন্তার চর্চা।

'পাক্ষিক চিন্তা'র পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার 'জার্মান ভাবাদর্শের ওপর নারী গ্রন্থ প্রবর্তনায় এই সময়ের তরুণরা নতুন করে পাঠচক্র শুরু করেছেন। শুধু মার্কস-লেনিনের অনুসারীরাই মার্কস-লেনিন পড়বেন- এটা কোনো জ্ঞানী মানুষই বলবেন না। তাছাড়া তাঁরাই বিপ্লবের শেষ কথা বলে গিয়েছেন- এই ধরনের ধার্মিকতাও চিন্তার জন্য অনুকূল নয়।

'বিশ্বাস' আর 'চিন্তা'র মধ্যে কি পার্থক্য? কেউ যদি বলে আমি আল্লায় 'বিশ্বাস' করি আর তার বিপরীতে অন্যজন বলেন আমি 'বিশ্বাস' করি 'যুক্তি', 'বুদ্ধি' বা 'চিন্তায়'- তাহলে দুটোই তো আসলে বিশ্বাস। কিসের ফারাক? এখন কেউ যদি আল্লার জায়গায় যুক্তি, বুদ্ধি বা চিন্তাকে বসায় তাহলে সেটা ধর্মতত্ত্ব নয়, আর আল্লা থাকলেই সেটা ধর্ম নয়- এটা তো হতে পারে না। অতএব ইডিওলজি, মতাদর্শ বা ধর্ম বলতে মার্কস কি বুঝিয়েছেন তার একটা বিচার অবশ্যই দরকার আছে।

মূল কথা হচ্ছে, এই কালে বাংলাদেশে বসে আমাদের মনে দর্শন, সমাজ, অর্থশাস্ত্র, রাজনীতি, সংস্কৃতি, ভাষা ইত্যাদি নানা বিষয়ে প্রশ্ন তৈরি হচ্ছে। সেই প্রশ্নগুলো যে যেখানে পারি এবং যেভাবে পারি মোকাবিলা আমাদের করতে হবে। সেই ডাকটুকু দেবার জন্যই লেখা। ছাত্র ঐক্য ফোরামের কথাটা মনে এলো এই কারণে যে, বুর্জোয়া শিক্ষার বিপরীতে জ্ঞানচর্চার জন্য 'বিকল্প পাঠশালা' গড়ে তোলার স্লোগান যতোটুকু আমি জানি একমাত্র ছাত্র ঐক্য ফোরামই আশির দশকে দেওয়া শুরু করে। জ্ঞান ও চর্চা বা চর্চা থেকে উৎপাদিত জ্ঞানের সারাৎসার সংগ্রহের দক্ষতা ছাড়া আমরা এগিয়ে যেতে পারব কি?

এটা নিশ্চয়ই আমরা জানি যে বিপ্লব বা বৈপ্লবিকতা মানে জ্ঞান চর্চা নয়। কিন্তু জ্ঞানের চর্চা ছাড়া বিপ্লব কথাটার কোনো মানে হয় না। বিপ্লব মাত্রই প্রজ্ঞার বাস্তবায়ন। মানুষ প্রকৃতি বা ইতিহাস সম্পর্কে প্রজ্ঞা তার পুরনো অবস্থান বিচার করে যখন নিজে আরো বিকশিত হয়ে ওঠে, যখন নতুন ধারণা, ইচ্ছা, সংকল্প তৈরি হয়। সেই ধারণার সঙ্গে যদি বাস্তব বা বৈষয়িক অবস্থার বিরোধ ঘটে, তখন তার মীমাংসার জন্যই বিপ্লব। বিপ্লব সব অর্থেই- জ্ঞানগতভাবে, আর্থ-সামাজিকভাবে এবং ক্ষমতা বা রাষ্ট্রের দিক থেকে।

আমরা যেন আমাদের চিন্তার প্রকল্পগুলো না ভুলি এবং যখনই নিজেদের তোলা প্রশ্নগুলো সম্পর্কে আমরা সজ্ঞান ও সদাসতর্ক হতে শিখব এবং প্রশ্ন যতোই কঠিন হোক তাকে মোকাবিলা করবার হিম্মত প্রদর্শন করব, তাতোই বৈপ্লবিকতার একটা সংস্কৃতি আমাদের সমাজে তৈরি হবে।